Living the Lotus 6

Buddhism in Everyday Life

2026
VOL. 249

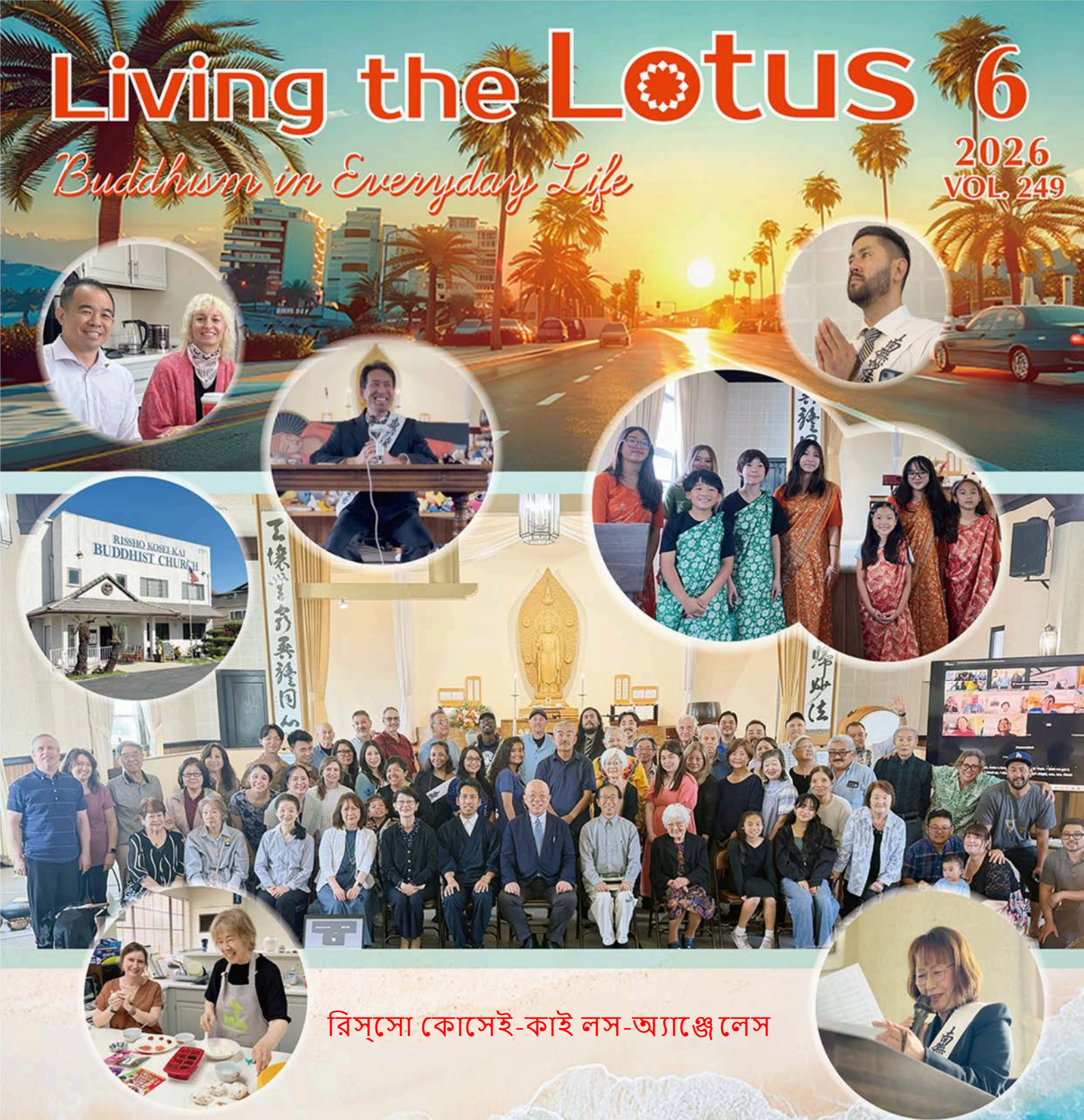

রিস্‌সো কোসেই-কাই লস-অ্যাঞ্জেলেস

Living the Lotus
Vol. 249 (June 2026)

Senior Editor: Rev. Takashi Maeda
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই। বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

দু:খও জীবনের এক অন্তরঙ্গ সঙ্গী

রেভারেন্ট নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

দু:খ আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি

আমি প্রায়ই আপনাদের একটি প্রশ্ন করেছি—"একটি গ্লাস যখন অর্ধেক জলে পূর্ণ থাকে, তখন আমরা সেটিকে কীভাবে দেখি, কীভাবে উপলব্ধি করি?" লেখক সেইকান কোবায়াশি বলেন, এই অবস্থাকে দেখার তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। প্রথমটি—"মাত্র অর্ধেকই আছে"—এই ভেবে অভিযোগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা। দ্বিতীয়টি—"অর্ধেক তো আছে, সেটাই আনন্দের"—এইভাবে আনন্দ অনুভব করা। তৃতীয়টি—"কেউ আমার জন্য অর্ধেক রেখে গেছেন, কত কৃতজ্ঞতার বিষয়"—এইভাবে কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি বা অর্থারোপ আমরা নিজেরাই করি। বাস্তব সত্য একটিই—"গ্লাসটি অর্ধেক জলে পূর্ণ।" আমরা অসন্তুষ্ট হই কিংবা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ন হই—সবই আমাদের নিজস্ব মনের প্রতিফলন।

গৃহীবৌদ্ধ হিসেবে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য বুদ্ধের শিক্ষা এমন হওয়া প্রয়োজন, যা সহজবোধ্য এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগযোগ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোবায়াশির এই বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি 'প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সূত্র'-এ বর্ণিত "সকল রূপই শূন্য"—এই গভীর তত্ত্বের আলোকে আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সুখ ও দুঃখসহ সকল ঘটনাই আমরা নিজের ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করি এবং তাতেই আনন্দ-বেদনার দোলাচলে নিমগ্ন হই। বিশেষ করে, যেসব ঘটনাকে আমরা দুঃখ বা কষ্টের কারণ বলে মনে করি, সেগুলোর অন্তরালে প্রায়ই লুকিয়ে থাকে আমাদের গোঁড়ামি, পক্ষপাত, ভ্রান্ত ধারণা, আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও আসক্তি। অর্থাৎ, আমরা নিজেরাই সেগুলিকে দুঃখের বীজে পরিণত করি। অতএব বলা যায়—যদি আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও গ্রহণ করার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারি, তবে জীবন আরও সহজ, প্রশান্ত ও স্বস্তিময় হয়ে উঠতে পারে। এই "গ্লাসের উপমা" সেই জীবনমুখী বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গির এক বাস্তব ও প্রাঞ্জল উদাহরণ।

দু:খভোগও জীবনের এক মূল্যবান অংশ

"জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু—এগুলোকে চার মহা দুঃখ বলা হয়; কিন্তু আমার কাছে এগুলো চার দুঃখ নয়, বরং চার আনন্দ"—এই উক্তিটি কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক কো হিরাসাওয়া মহোদয়ের। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলে জীবন আসলে আনন্দ ও উপভোগের এক অবিরাম প্রবাহ হয়ে ওঠে। কবি সাকামুরা শিনমিন সাধারণত যাকে দুঃখ ও যন্ত্রণার বিষয় হিসেবে দেখা হয়, সেই অসুস্থতাকেই এক কোমল কৃতজ্ঞতাবোধে রূপ দিয়েছেন—"রোগ, আরও একটি জগত আমার সামনে উন্মুক্ত করল—পীচফুল ফুটে উঠল।"

এই কবিতায় দুঃখের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা এক স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক শিমোমুরা কোজিন বলেছেন—"আমি এমন এক জগতে বাস করতে চাই, যেখানে দুঃখ-কষ্ট হতাশার কারণ না হয়ে, বরং সাহসের প্রেরণা হয়ে ওঠে।" পূর্বে উল্লেখিত সেইকান কোবায়াশি মহোদয় 'গ্লাসের পানির' উদাহরণের মাধ্যমে 'শূন্যতা'-র যে শিক্ষা তুলে ধরেছেন, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"একই ঘটনায় কীভাবে আনন্দ ও সুখ খুঁজে পাওয়া যায়—এটিই এক ধরনের অনুশীলন; তথাগত বুদ্ধ আমাদের সেই শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন।" অর্থাৎ, যেসব ঘটনাকে আমরা বেদনাদায়ক বলে মনে করি, সেগুলোকেও নানাভাবে দেখা ও গ্রহণ করা সম্ভব—যা আমাদের জীবনে নতুন সাহস এবং নতুন পথের দিশা এনে দেয়। কিন্তু যদি আমরা একপাক্ষিকভাবে কেবল 'কষ্ট' বা 'যন্ত্রণা' হিসেবেই তাকে দেখি, তবে আমরা সেই 'দুঃখ'-এর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি এবং আত্মোন্নয়নের মূল্যবান সুযোগ হারিয়ে ফেলতে পারি।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, বেদনাদায়ক ঘটনাগুলিকে জোর করে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে হবে। বরং এর অর্থ হলো—বিষয়গুলোকে বহুমাত্রিক দৃষ্টিতে দেখা। অনিত্যতার সত্য এবং কারণ-সম্পর্কের (প্রতিত্যসমুৎপাদ) শিক্ষার আলোকে উপলব্ধি করলে বোঝা যায়, যতই গভীর দুঃখ-কষ্ট আসুক না কেন, তা জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহেরই একটি অনিবার্য পর্ব। অধিকন্তু, এই দুঃখ-কষ্টই আমাদের এক সৃজনশীল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারে—যেমন একটি শিশুর ধীরে ধীরে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠে। হয়তো এতে কিছুটা সময় লাগে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা দুঃখকে জীবনের পাথেয় ও আনন্দে রূপান্তরিত করতে সক্ষম।

একটি উপন্যাসে বলা হয়েছে—"সমস্ত ভালো-মন্দ ঘটনাই তোমাকে আজকের 'তুমি' হিসেবে গড়ে তুলেছে। যদি কোনো খারাপ ঘটনা না ঘটত, তবে তুমি আজ যেমন আছো তেমন হতে না। আবার যদি কোনো ভালো ঘটনাও না ঘটত, তাহলেও তুমি আজকের 'তুমি' হতে পারতে না।" অর্থাৎ, দুঃখ-কষ্ট আমাদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং অমূল্য অভিজ্ঞতা। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হারুও সাজি বলেছেন—"যদি অতীতের সঞ্চয়ই 'বর্তমান'-কে গঠন করে থাকে, তবে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা কীভাবে এই 'বর্তমান'-কে নির্মাণ করি, তার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ এবং এমনকি অতীতকেও নতুন অর্থে উপলব্ধি করা সম্ভব।" এই অর্থে, অতীত থেকে সঞ্চিত সুখ-দুঃখ উভয়কেই জীবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে নিজের ভবিষ্যতের কল্যাণ, মানবিক মানুষ হওয়া, এবং এই পৃথিবীর আগামীর মঙ্গল চিন্তা করে, "বর্তমান"-এ যথার্থভাবে বেঁচে থাকাই আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

('কোসেই' জুন, ২০২৬ইং।)

শেষ নিঃশ্বাস অবধি, অবিচলচিত্তে ধর্মপ্রচার করে যেতে চাই

মিসেস স্বর্ণা পদ্মিনী দেলগোডা, রিস্‌সো কোসেই-কাই শ্রীলংকা।

২০২৫ সালের ৫ই মার্চ মূলমন্দিরে অনুষ্ঠিত "৮৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে" গুণীজনদের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্বারক প্রদান করা হয়েছিল।

সবাইকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

'ভারত মহাসাগরের মুক্তা' নামে পরিচিত মনোরম দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা থেকে আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি, আমার নাম স্বর্ণা পদ্মিনী দেলগোডা। বর্তমানে আমি শ্রীলঙ্কা ধর্মকেন্দ্রের মহাব্যবস্থাপক এবং রিস্‌সো কোসেই ধম্ম ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। বুদ্ধের সেবায় নিজেকে বিনীতভাবে উৎসর্গ করতে পেরে আমি গভীর কৃতজ্ঞতায় নত হই। আজ আপনাদের সামনে এই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগকেও আমি বুদ্ধেরই এক অপার কৃপা ও আয়োজন বলে অনুভব করছি।

আমি ছয় ভাইবোনের এক বড় ও সুখী পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমাদের ছিল তিন বোন ও দুই ভাইয়ের স্নেহময় সংসার, আর আমি ছিলাম পরিবারের পঞ্চম সন্তান। কিন্তু আমার বয়স যখন মাত্র ছয় বছর, তখনই জীবনে নেমে আসে এক গভীর অন্ধকার। আমাদের পরিবারের প্রধান অবলম্বন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যু আমার কোমল শিশুমনে গভীর শোক ও আতঙ্কের ছাপ ফেলে। দীর্ঘদিন ধরে আমার মনে হতো, যেন আমার সমস্ত পৃথিবীটাই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আজও সেই শৈশবের বেদনা আমার হৃদয়ের গভীরে অম্লান হয়ে আছে এবং আমার জীবনগঠনের পথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তীতে পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে আমার মা আমাকে একটি ক্যাথলিক মিশনারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কারণ তখন আমার পক্ষে একা স্কুলে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল না। আশ্চর্যের বিষয়, স্কুল জীবন আমি এতটাই উপভোগ করতাম যে ছুটির দিনেও বাড়ি ফিরতে মন চাইত না। মা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন—হয়তো আমি একসময় ধর্মান্তরিত হয়ে পড়ব। তাই তিনি আমাকে সেই স্কুল থেকে সরিয়ে একটি বৌদ্ধ বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনই পরবর্তীতে আমার কর্মজীবন ও জীবনদর্শনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নতুন বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও বন্ধুদের স্নেহ-সমর্থনে আমি ধীরে ধীরে আনন্দ ফিরে পাই। বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে কেক ও মিষ্টান্ন তৈরি করা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় কাজ। আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে ভাবতাম—"কীভাবে এটি আরও সুস্বাদু করা যায়?" "কীভাবে এটি খাইয়ে মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যায়?" অন্যকে আনন্দ দেওয়ার এই নির্মল আকাঙ্ক্ষাই পরবর্তীকালে আমার জীবনের নতুন দুয়ার খুলে দেয়।

পঁচিশ বছর বয়সে আমি এক বিরাট সৌভাগ্যের সম্মুখীন হই। শ্রীলঙ্কার সুপরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান 'মালিবান বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারিজ'-এ চাকরির সুযোগ লাভ করি। তখনও বুঝতে পারিনি, এই ঘটনাই আমার জীবনের গতিপথ বদলে দেবে। আমি একজন সাধারণ সুপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করি। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে যে অনুসন্ধিৎসু মন ছিল, তা আমাকে কঠোর পরিশ্রমে অনুপ্রাণিত করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের

পবিত্র মূলমন্দিরে বক্তব্য রাখছেন মিসেস দেলগোডা।

বিভিন্ন বিস্কুট কারখানা পরিদর্শন করে আধুনিক প্রযুক্তি শেখার সুযোগ পাই। দিনের পর দিন নতুন পণ্য উদ্ভাবনের কাজে নিজেকে নিবিষ্ট রাখি। আমার নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ, সে সময়ের সামাজিক বাস্তবতায় যা একজন নারীর জন্য ছিল অত্যন্ত বিরল, আমাকে দ্রুত ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের পদে উন্নীত করা হয়।

এই সময়েই আমার জীবনে এক মহান আশীর্বাদ নেমে আসে—আমার প্রিয় স্বামীর সঙ্গে পরিচয়। আমাদের দাম্পত্য জীবন ছিল পরম সৌহার্দ্যপূর্ণ। দীর্ঘ জীবনে কখনও আমরা কঠোর বাক্য বিনিময় করিনি, এমনকি তীব্র তর্কেও জড়াইনি। কর্মজীবনের সাফল্য, পারিবারিক শান্তি এবং আমাদের প্রিয় পুত্রসন্তানের আগমনে জীবন যেন পূর্ণতা লাভ করেছিল।

কিন্তু ১৯৮৯ সালে শ্রীলঙ্কা ভয়াবহ রাজনৈতিক সহিংসতার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত হয়। সরকারি বাহিনী ও সরকারবিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সংঘাতে চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় প্রতিনিয়ত গোলাগুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যেত। মানুষ এমন এক সময় অতিক্রম করছিল, যাকে সত্যিই "ভয়ের যুগ" বলা যায়—যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল অনিশ্চিত, আর জীবন ছিল মৃত্যুভয়ের ছায়ায় আচ্ছন্ন। কর্মক্ষেত্রে ম্যানেজার হিসেবে আমার অবস্থানের কারণে আমি নিজেও ঝুঁকি অনুভব করতে শুরু করি। রাতের পর রাত উদ্বেগে নির্ঘুম কাটত। একসময় উপলব্ধি করলাম—এই পরিস্থিতিতে আমি আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপদ রাখতে পারব না। অবশেষে অত্যন্ত বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে বহু প্রিয় কর্মস্থল থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই।

পরবর্তীতে পারিবারিক বন্ধুদের পরামর্শে নিরাপত্তার আশায় আমি একা অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে পাড়ি জমাই। স্বামী ও সন্তানকে পেছনে রেখে আসা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর অভিজ্ঞতাগুলোর একটি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা ও কর্মজীবনের

অভিজ্ঞতার কারণে আমি খুব দ্রুত সেখানে একটি চাকরি পেয়ে যাই। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার ছেলেকেও অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে এসে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে সক্ষম হই। জীবন যখন আবার ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হয়ে উঠছিল, তখন আমার হৃদয়ের গভীরে একটি প্রশ্ন বারবার জেগে উঠতে লাগল—"ভবিষ্যতেও যেন আমরা শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারি, সেই জন্য আমি কী করতে পারি?"

১৯৯৩ সালে, শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করলে, আমিও দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তখন আমার পুত্র অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। তাকে সেখানেই রেখে আমি স্বামীর কাছে ফিরে আসি এবং আমরা একসঙ্গে জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করি। আমরা একটি "পার্টি শপ" প্রতিষ্ঠা করি, যেখানে জন্মদিন, বিবাহসহ নানা উৎসব ও অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, সাজসজ্জা এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হতো। সে সময় শ্রীলঙ্কায় এ ধরনের দোকান ছিল অত্যন্ত বিরল। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের ব্যবসা দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়।

এই সময়ে আমাদের দোকানের একজন নিয়মিত অতিথি ছিলেন শ্রী গামিনী চন্দ্রশেখর। তিনি তখনকার রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর শ্রীলঙ্কা সমন্বয় কার্যালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাকে তাঁদের কার্যক্রম দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁর বাড়িটিই তখন কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রথমদিকে আমি তাঁর অনুরোধ বিনয়ের সঙ্গে এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা ও একাগ্র আহ্বানে অবশেষে একদিন আমি এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাই। আর সেদিন আমি এমন এক দৃশ্য দেখেছিলাম, যা আজও আমার হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেখানে আমি শাক্যমুনি বুদ্ধের এক দাঁড়ানো মূর্তি দর্শন করি।

শ্রীলঙ্কা থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্রভূমি। আমাদের দেশে সাধারণত বুদ্ধমূর্তি বলতে ধ্যানমগ্ন, আসীন বুদ্ধের রূপই পরিচিত। কিন্তু সেই বুদ্ধমূর্তি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন এক পা এগিয়ে আমাদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসছেন। আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অনুভূত হলো—"এমনও এক বুদ্ধ আছেন, যিনি কেবল বসে অপেক্ষা করেন না; বরং স্বয়ং মানুষের কাছে এগিয়ে আসেন।" এই উপলব্ধি আমার হৃদয়কে এক অপূর্ব উষ্ণতা, শান্তি ও আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

এরপর প্রবল আগ্রহ নিয়ে আমি প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিও নিওয়ানোর জীবন ও শিক্ষাবিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে শুরু করি। সেই শিক্ষার মধ্যেই আমি দীর্ঘদিন ধরে নিজের মনে জাগ্রত একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই—"মানুষের শান্তির জন্য আমি কী করতে পারি?" তখন আমার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয়—"এই শিক্ষাই সেই সত্য, যার সন্ধান আমি এতদিন ধরে করে এসেছি।" অবশেষে ১৯৯৮ সালে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে রিস্‌সো কোসেই-কাই-তে যোগদান করি।

যতই আমি এই ধর্মশিক্ষা অধ্যয়ন করতে থাকলাম, ততই আমার হৃদয়ে আশা ও প্রেরণার আলো উজ্জ্বল হতে লাগল। প্রতিষ্ঠাতার মতো মানুষের সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করার এক গভীর আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে জন্ম নেয়। আমি অনুভব করলাম—নিজের সমগ্র জীবন বুদ্ধের পথে নিবেদন করাই আমার সত্যিকার কর্তব্য। এই উপলব্ধি থেকেই আমি একটি কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বহু সফলতা অর্জন করা আমাদের লাভজনক ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে ধর্মপ্রচার ও মানুষের কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করার সংকল্প করি। চারপাশের অনেকে আমাকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "এত সুন্দরভাবে চলা ব্যবসা বন্ধ করা তো অপচয়!" কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। কারণ আমি উপলব্ধি করেছিলাম—অর্থ উপার্জনের চেয়ে

শ্রীলংকা শাখার বন্দনায় দণ্ডসির দায়িত্ব পালন করছেন মিস. দেলগোডা

মানুষের হৃদয়কে ধর্মের আলোয় সমৃদ্ধ করা অত্যন্ত মূল্যবান। সেই সময় থেকে আমি নিজের জীবনের জন্য একটি নিয়ম স্থির করি। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম— "আমি পারব না", "এটা অসম্ভব", "আমি জানি না কীভাবে করব"—এই ধরনের কোনো নেতিবাচক শব্দ আমি আর মুখে আনব না, এমনকি মনেও স্থান দেব না।

২০১০ সালে শ্রীলঙ্কা ধর্মকেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ধর্মকেন্দ্র প্রধান, রেভারেন্ড ইয়োশিহিসা ইয়ামামতো আমাকে মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি প্রায়ই আমাকে একটি কথা বলতেন—"দেলগোদা-সান, বুদ্ধের অমূল্য জীবন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেই বিদ্যমান।" এই একটি বাক্য আমার জীবনদৃষ্টি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। আমি উপলব্ধি করতে শিখলাম—যেমন আমার নিজের জীবন মূল্যবান, তেমনি আমার সামনে থাকা প্রতিটি মানুষের জীবনও সমানভাবে পবিত্র ও সম্মানযোগ্য।

তবে ধর্মপ্রচারের পথ মোটেও সহজ ছিল না। থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের দৃঢ় ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রীলঙ্কায়, রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর মহাযান শিক্ষা প্রচার করতে গিয়ে আমরা বহু সমালোচনা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হই। স্থানীয় মন্দিরসমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেও নানা আপত্তি উঠতে থাকে। বিশেষ করে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় আইনি নিবন্ধনের সমস্যা। শ্রীলঙ্কা সরকার আমাদের ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম পরিচালনা এবং ব্রাঞ্চপ্রধানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ভিসা লাভ করাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এই সময়ে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন শুরু করি। শুধু কথায় নয়, নিজের আচরণ ও কর্মের মাধ্যমেও আমি প্রতিটি মানুষের অন্তরে বিরাজমান বুদ্ধকে সম্মান জানাতে সচেষ্ট হই। যারা আমাদের বিরোধিতা করতেন, এমনকি সমালোচনাকারী প্রতিবেশীদের প্রতিও আমি হাত জোড় করে প্রার্থনা চালিয়ে যেতাম। সম্ভবত সেই আন্তরিক প্রার্থনাই একদিন ফলপ্রসূ হয়েছিল। অবশেষে "এনজিও" হিসেবে নিবন্ধনের একটি পথ উন্মুক্ত হয় এবং আমরা আইনগত স্বীকৃতি লাভ করি। আজও আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি—এটি কেবল মানুষের শক্তিতে সম্ভব হয়নি; বরং আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে অবস্থানরত বুদ্ধসত্তার শক্তিই একে অপরকে আহ্বান করে এই পথ খুলে দিয়েছে।

২০১৫ সাল থেকে আমাদের কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে "গৃহভিত্তিক হোজা" বা "সহানুভূতির বৃত্ত"। সদস্যদের বাড়িতে আয়োজিত এই ছোট ছোট সমাবেশে মানুষ একত্রিত হয়ে নিজেদের আনন্দ, দুঃখ, উদ্বেগ ও জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। এই আন্তরিক ও উষ্ণ পরিবেশ বহু মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। শ্রীলঙ্কার নানা

প্রান্ত থেকে অনেকে এগিয়ে এসে বলতে শুরু করেছেন—"আমিও একজন হোজা লিডার হতে চাই।" বর্তমানে প্রায় আশিজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা এই কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে সহানুভূতি, মৈত্রী ও ধর্মের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

গৃহভিত্তিক হোজা কার্যক্রমের একজন নেতা হিসেবে আমিও প্রতি মাসের চব্বিশ তারিখে আমাদের গৃহের বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা দিবসে হোজা আয়োজন করে থাকি। গৃহভিত্তিক হোজার সবচেয়ে সুন্দর দিক হলো—এটি একটি আন্তরিক, স্বস্তিদায়ক ও পারিবারিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। তাই মানুষ সহজেই তাদের হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা দুঃখ, কষ্ট ও দুশ্চিন্তার কথা অকপটে প্রকাশ করতে পারেন।

একদিন এমনই এক হোজায় সদস্যদের জীবনের নানা কথা শুনতে শুনতে আমার অন্তরে হঠাৎ এক গভীর উপলব্ধি জেগে উঠল। সেটি ছিল নিজের জীবনকে ফিরে দেখার এক মূল্যবান মুহূর্ত। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম—"এতদিন আমি কি সত্যিই আমার স্বামীর প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরেছি?" আমার স্বামী, যিনি আজ থেকে দশ বছর আগে পরলোকগমন করেছেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত, সহনশীল ও স্নেহময় একজন মানুষ। আমার দৃঢ়চেতা ও একরোখা স্বভাবকে তিনি সবসময় মমতার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। আমি যখন অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আবার দেশে ফিরে এসেছিলাম, রিসসো কোসেই-কাই-এ যোগদান করেছিলাম, এমনকি ব্যবসা ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলাম—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি নীরবে, কোমল সম্মতির মাধ্যমে আমাকে সমর্থন করে গেছেন। হোজার এই সাধনাপথের মধ্য দিয়ে আমি নিজের অতীতকে নতুন করে উপলব্ধি করতে শিখেছি। অনুতাপ ও কৃতজ্ঞতার আলোয় আজ আমি আমার সেই প্রয়াত স্বামীর প্রতিও আগের চেয়ে আরও গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে পারি। মনে হয়, তিনি এখনো অদৃশ্য জগত থেকে নীরবে আমাকে আশীর্বাদ করে চলেছেন।

আজ আমার বয়স চুরাশি বছর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ধর্মপ্রচারের প্রতি আমার উৎসাহ ও উদ্দীপনা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে আরও গভীর ও প্রজ্বলিত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—শ্রীলঙ্কার শান্তি হোক কিংবা সমগ্র বিশ্বের শান্তি, তা কোনো একজন ব্যক্তি কোথাও বসে আমাদের জন্য তৈরি করে দেবেন না। প্রকৃত শান্তির সূচনা হয় তখনই, যখন আমরা প্রত্যেকে নিজের অন্তরের বুদ্ধপ্রকৃতিকে জাগ্রত করি এবং আমাদের পাশের মানুষের মধ্যেও সেই পবিত্র বুদ্ধত্বকে শ্রদ্ধাভরে উপলব্ধি করি।

বক্তব্য প্রদানের দিন, যারা তাকে সমর্থন করতে এসেছিলেন

আমাদের দ্বিতীয় ব্রাঞ্চপ্রধান, শ্রদ্ধেয় সুজুকি মহোদয়ের শিক্ষা অনুসারে, আমি হোজার গুরুত্ব আরও গভীরভাবে হৃদয়ে ধারণ করি। করুণা, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রবণের এই ছোট ছোট বৃত্তই একদিন সত্যিকারের শান্তির ভিত্তি নির্মাণ করবে—আমি এ বিশ্বাস ধারণ করি। ভবিষ্যতেও আমি গৃহভিত্তিক হোজার মাধ্যমে আরও বহু মানুষের কাছে এই মহামূল্যবান শিক্ষা পৌঁছে দিতে চাই।

শ্রীলঙ্কায় একটি প্রবাদ আছে—"গরুর গাড়ি ধীরে চললেও, পথ যদি সঠিক হয়, তবে একদিন ঠিকই গন্তব্যে পৌঁছায়।" অতএব, অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল ইতিবাচক মন নিয়ে সঠিক পথে অবিচলভাবে এগিয়ে চলা। সদস্যদের সামনে সেই জীবনদৃষ্টিকে নিজের আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করাই আমার সাধনা।

পরিশেষে, "এখানে এবং এখন যে জীবন বিদ্যমান"—তাকে গভীর মমতায় ধারণ করে, এই মহান মহাবিশ্ব ও প্রকৃতির অসীম অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে, আমি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই মহৎ ধর্মপ্রচারের পথে অগ্রসর হতে চাই। বর্তমান ব্রাঞ্চপ্রধান শ্রদ্ধেয় আকাগাওয়া মহোদয়ের দিকনির্দেশনায়, আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে একত্রে সাধনা করে যেতে চাই, যেন শ্রীলঙ্কার ভূমিতে ধর্মের শুভ্র পদ্মফুল আরও সুন্দরভাবে, আরও ব্যাপকভাবে কুসুমিত হতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম। ধন্যবাদ।

ব্রাঞ্চপ্রধান আকাগাওয়া (সামনের সারিতে ডান দিক থেকে তৃতীয়) মহোদয়ের অভিষেক অনুষ্ঠানে পর

ধর্মানুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র

ধর্মানুশীলন করুন এখানে, এখনই

সকল অভিজ্ঞতাই বোধি লাভের জন্য

গত মাসের ধারাবাহিকতায় রিসসো কোসেই-কাইয়ের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা ড. ডমিনিক স্কালাঞ্জেলো এর রচিত "এখানেই সাধনাক্ষেত্র" শীর্ষক ভাবনাটি এখানে উপস্থাপন করা হলো। "এখানেই সাধনাক্ষেত্র"—এই ধারণাটি সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের "তথাগতের দৈবশক্তি" অধ্যায়ে বর্ণিত সেই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে কোনো স্থানই সাধনার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। "এখানেই, এখনই সাধনার ক্ষেত্র"—এই শিক্ষা আমাদের নীরবে অনুপ্রাণিত করে, যেন পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বিদ্যালয় অথবা দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো পরিসরেই আমরা ধর্মবাণীকে বাস্তবে প্রয়োগ করি এবং বোধিচিত্তকে জাগ্রত করি।

ডঃ ডমিনিক স্কারাঞ্জেলো

গত কয়েকটি পর্বে আমরা দুঃখ মোচনের উদ্দেশ্যে "দশস্বরূপতা"-এর শিক্ষার আলোকে সাধনার পথ নিয়ে অধ্যয়ন করে আসছি। নিঃসন্দেহে, বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হিসেবে আমরা নিজেদের এবং অপরের দুঃখ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে চাই। তবে কখনও কখনও দেখা যায়, এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের এক গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে অজান্তেই উপেক্ষা করি। গত পর্বে প্রতিষ্ঠাতা নিওয়ানোর একটি মূল্যবান শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছিল—"জীবনে সংঘটিত প্রতিটি কারণই কল্যাণের কারণ হতে পারে।" আসুন বিষয়টি আরও গভীরভাবে অন্বেষণ করি।

রিসসো কোসেই-কাই এর মৌলিক দর্শন-এ রেভারেন্ড কোসো নিওয়ানো মহোদয়া একটি গভীর তাৎপর্যময় শিক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন—"ধর্মের শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবভাবে অনুশীলন করার মাধ্যমে আমরা অবশ্যই নানা দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছি, এবং আমাদের জীবনেও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু রিসসো কোসেই-কাই-এর শিক্ষা কেবল দুঃখ দূর করার জন্য নয়।"

প্রথমে এই বার্তাটি আমাদের কাছে কিছুটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে—"আমরা কি দুঃখ দূর করে সুখী হওয়ার জন্যই বুদ্ধের শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করি না?" "দুঃখ কি নিজেই একটি সমস্যা নয়?" "বৌদ্ধ সাধনার উদ্দেশ্য কি দুঃখের কারণ উদ্ঘাটন করে তা দূর করা নয়?"

কিন্তু রেভারেন্ড কোসো নিওয়ানো মহোদয়া বলেন—"রিসসো কোসেই-কাই-এর শিক্ষা এমন এক শিক্ষা, যা মানুষকে দুঃখের মধ্য দিয়েই মুক্তির পথে পরিচালিত করে। কারণ কাদামাটির মাঝেই এক অপূর্ব পদ্মফুল ফোটে ওঠে।"

এখানে দুঃখকে দেখার এক গভীর বৈপরীত্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। আমরা সাধারণত দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চাই বলেই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করি। কিন্তু সত্য হলো—দুঃখের মুখোমুখি হয়ে, তাকে গ্রহণ করে এবং তার সঙ্গে সংগ্রাম করেই মানুষ প্রকৃত জাগরণ ও আত্মউপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে। এই দৃষ্টিতে দেখলে—দুঃখ কেবল কষ্টের কারণ নয়; বরং তা আমাদের চরিত্রকে পরিণত করে, হৃদয়কে গভীরতর করে এবং আরও অর্থপূর্ণ ও পরিপূর্ণ জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক মূল্যবান অনুঘটক হয়ে উঠতে পারে।

আপনাদের অনেকেই হয়তো মহাপবিত্র মূলমন্দিরের পদ্মবাগান দর্শন করেছেন। পদ্ম পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর ফুল—যা পবিত্রতা, নির্মলতা ও বোধিজ্ঞানের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, পদ্ম কখনও স্বচ্ছ ও নির্মল জলে জন্মায় না। বরং এটি জন্ম নেয় ঘোলা, স্থির ও কাদাময় জলের মধ্যে—যে জল পান করলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। যেসব পরিস্থিতিকে আমরা অশুদ্ধ, অপ্রিয় বা অপ্রীতিকর বলে মনে করি, ঠিক সেই পরিবেশই পদ্মকে বেড়ে উঠতে, শক্তি সঞ্চয় করতে এবং একসময় অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হতে সহায়তা করে।
একই কথা আমাদের জীবনেও প্রযোজ্য।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক মানুষই বুদ্ধত্ব লাভের সম্ভাবনা ধারণ করে। "উপায়-কৌশল্য অধ্যায়"-এ বলা হয়েছে—"বুদ্ধত্বের বীজ বিভিন্ন কারণ ও পরিস্থিতির মাধ্যমে জাগরিত হয়।" আর সেই "পরিস্থিতি"-র মধ্যে হয়তো আমাদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, সংগ্রাম, ব্যর্থতা ও প্রতিকূল অভিজ্ঞতাগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

"দেবদত্ত অধ্যায়"-এ শাক্যমুনি বুদ্ধ একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, অতীতজন্মে তিনি "অসিত" নামক এক ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন—যিনি দেবদত্তের পূর্বজন্ম হিসেবে পরিচিত। আর সেই সাক্ষাৎই পরবর্তীকালে তাঁর বোধিলাভের এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে ওঠে। ঋষি অসিত বহু বছর ধরে অতীতজন্মের শাক্যমুনিকে কঠোর সাধনা ও কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করেছিলেন।

দেবদত্তের কাহিনি সম্পর্কে আপনাদের অনেকেই হয়তো অবগত আছেন। কিন্তু সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র আমাদের সামনে এক গভীর প্রশ্ন তুলে ধরে—আমরা প্রতিকূলতা ও দুঃখকে আসলে কীভাবে দেখব? দেবদত্ত কেবল একজন বিরক্তিকর বা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি ছিলেন না। ইতিহাসের বহু কুখ্যাত অপরাধীর মতো তিনিও ভয়াবহ কাজ করেছিলেন এবং অসংখ্য মানুষের জীবনে অপরিমেয় কষ্ট ও দুঃখের কারণ হয়েছিলেন। তিনি

সত্যিই এক ভয়ংকর ও বিদ্বেষপূর্ণ চরিত্র হিসেবে পরিচিত। তবুও শাক্যমুনি বুদ্ধ শিক্ষা দেন যে, দেবদত্ত শেষ পর্যন্ত বোধিসত্ত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন। কারণ তাঁর মাধ্যমেই বুদ্ধ এমন অভিজ্ঞতা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন, যা শেষ পর্যন্ত তাঁকে বোধিলাভের পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিল।

এখানেই একটি গভীর প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে— এত কষ্ট ও অমঙ্গল ডেকে আনা একজন মানুষকে কীভাবে "বোধিসত্ত্ব" বলা যায়? এর অন্তর্নিহিত অর্থই বা কী?

প্রকৃতপক্ষে, এর উত্তর নিহিত রয়েছে শাক্যমুনি বুদ্ধের হৃদয়ের গভীর প্রজ্ঞায়।

আমাদের জীবনেও এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা কঠিন পরিবেশ, অন্যের আচরণ বা নির্মম পরিস্থিতির কারণে গভীর দুঃখ ও কষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন। সেইসব অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো কল্যাণকর অর্থ বা শিক্ষার সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন বলে মনে হয়। তার উপর এই পৃথিবীতে এমন কিছু অনিবার্য দুঃখও রয়েছে—যেমন রোগ, বার্ধক্য, প্রিয়জনের মৃত্যু এবং শেষ পর্যন্ত নিজের মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া—যা কোনো মানুষই সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু বুদ্ধের শিক্ষা আমাদের জানায়—যদি আমরা হতাশ হয়ে ভেঙে না পড়ে, জীবনের কঠিন বাস্তবতাকেও আত্মজাগরণের এক সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, তবে সেই দুঃখের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বদলে যেতে পারে।

তবে প্রশ্ন হলো—কীভাবে এমন সাধনা সম্ভব? কীভাবে মানুষ দুঃখের মধ্য দিয়েও জাগরণের পথ খুঁজে পেতে পারে? এ কথা কেবল ভাষায় ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। কিন্তু আমি এই সত্যের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছি এমন দুইজন প্রিয় মানুষের জীবন থেকে, যারা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

তাদের একজন নিজের ক্যানসারের বাস্তবতাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। ক্রমশ তিনি চারপাশের পৃথিবীর প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও অভিমানে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। "কেন আমার সঙ্গেই এমন হলো?"—এই বেদনা ও রাগ তাঁর অন্তরকে গ্রাস করেছিল। ফলে, তিনি যে অমূল্য জীবন পেয়েছিলেন, কিংবা এতদিন অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন—সেসবের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতিও ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এমনকি পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটানোর শেষ সময়গুলোও তিনি শান্ত ও স্নেহপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি গভীর কষ্ট, তিক্ততা ও অভিমান হৃদয়ে ধারণ করেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

অন্য একজন মানুষ একই রোগের মুখোমুখি হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবনদৃষ্টি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের অসুস্থতাকে অস্বীকার করেননি, কিংবা শুধুই হতাশা ও অভিযোগের মধ্যে ডুবে থাকেননি। বরং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—এই কঠিন বাস্তবতাকেই তিনি নিজের সাধনা ও আত্মজাগরণের অংশ হিসেবে গ্রহণ করবেন। তিনি তাঁর অবশিষ্ট সময়টুকু প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর ও আন্তরিক করে তোলার জন্য ব্যয় করেছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে, তাঁর সমগ্র জীবন আসলে অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা ও মমতায় পূর্ণ ছিল। সেই সময় তাঁর হৃদয়ে যে উষ্ণতা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জন্ম নিয়েছিল, তা তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের যেকোনো অভিজ্ঞতার চেয়েও গভীর ছিল। এমনকি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও তাঁর অন্তর ভয়, ক্ষোভ বা অভিমানে আচ্ছন্ন হয়নি। বরং তিনি নিজের অসুস্থতাকেও আত্মজাগরণ ও বোধিলাভের এক মূল্যবান সুযোগ হিসেবে দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁরা আমার জন্য বোধিসত্ত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের জীবন ও দেহের মাধ্যমে আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন—বোধিলাভের পথে জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করার গুরুত্ব।

জীবনের প্রতিটি ঘটনা, তা যতই কঠিন বা বেদনাদায়ক হোক না কেন, আমাদের অন্তর্নিহিত বুদ্ধস্বভাবকে বিকশিত করার এক মূল্যবান সুযোগ হয়ে ওঠে। এই উপলব্ধি শুধু আমাদের নিজের জীবনকেই নয়, আমাদের চারপাশের মানুষের জীবনকেও সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। এই গভীর সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করে, প্রতিটি দিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যাপন করাই এখন আমার আন্তরিক কামনা।

তথাগতের চীবর পরিধান করা

‘ক্ষান্তি’র অর্থ ক্ষমাশীল হওয়া

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

ওকিনাওয়া প্রদেশের কুমেজিমা দ্বীপে তাঁর স্ত্রী নাওকোর সাথে (১৯৮৪)

“ক্ষান্তি” মানে হলো মানুষকে ক্ষমা করা। কে প্রথম এ কথা বলেছিলেন তা মনে নেই, কিন্তু “ভালোবাসা হলো ক্ষমা”—এই বাক্যটি আমার হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে। অবশ্য, পিতা-মাতা ও সন্তান কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যে স্নেহ জন্মায় তা আলাদা; কিন্তু সাধারণ মানবসম্পর্কে যে “ভালোবাসা” তৈরি হয়, তা সত্যিই ক্ষমার মাধ্যমেই লালিত ও পুষ্ট হয়।

আমি এর সঙ্গে আরও যোগ করতে চাই— “ক্ষমা মানে বোঝা; অপরকে উপলব্ধি করা।”

আমি যখন নতুন নাবিকদের বলেছিলাম যে তাদের আমি কখনোই আঘাত করব না, তার পেছনে ছিল এই উপলব্ধি—এদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে মারধর ছাড়া শিক্ষা নিতে সক্ষম নয়। তখন ছিল নিরস্ত্রীকরণের যুগ; ক্লাস-এ সামরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নৌবাহিনীতে প্রবেশ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। এমন যোগ্য যুবকদের চড়-থাপ্পড় করা—এটি আমার কাছে অত্যন্ত অশোভন মনে হয়েছিল। এইভাবে ভাবতে ভাবতেই স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছিল—“এরা আমার কাছে মূল্যবান মানুষ।” আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—“আমি কাউকে আঘাত করব না।”

এটি কোনো গর্বের গল্প নয়—আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধৈর্য, অহিংসা, উপলব্ধি ও ভালোবাসার সূক্ষ্ম সম্পর্কের কথা বলছি।

বুদ্ধ যখন গৃহত্যাগ করলেন, তাঁর পালিতা মাতা মহাপ্রজাপতি গৌতামী মনস্থ করলেন—একদিন অবশ্যই তিনি নিজের হাতে তৈরি একখানি চীবর বুদ্ধকে পরাবেন। তাই তিনি তুলা কাটলেন, সুতো কাটলেন, তন্তু বুনলেন, সোনালি সুতোয় নকশা করে এক অপূর্ব চীবর তৈরি করলেন। বুদ্ধ যখন বোধিলাভের পর প্রথমবার কপিলাবস্তুতে ফিরে এলেন, তিনি সেই চীবর অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করলেন। কিন্তু বুদ্ধ সেটি নিজে পরিধান না করে সংঘকে দান করলেন। তবে চীবরটি এতটাই দৃষ্টিনন্দন ছিল যে কেউই তা পরতে সাহস পেল না।

তখন বুদ্ধ মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বকে তা পরিধানের নির্দেশ দিলেন। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব চীবরটি পরতেই তাঁর দেহে বুদ্ধের মতোই বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ প্রকাশ পেল। তিনি যখন ভিক্ষান্ন গ্রহণে পথে বের হলেন—শহরের মানুষ তাঁর সৌন্দর্যে এতটাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তাঁকে খাদ্য দিতেও ভুলে গেলেন।

আড়াই হাজার বছর পর আজও— যদি আমরা আমাদের অন্তরে "বিনয় ও ক্ষান্তি"–এর এই চীবর পরিধান করতে পারি— তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যেও বুদ্ধের মহিমা প্রতিফলিত হবে।

দামি বা আড়ম্বরপূর্ণ পোশাকের চেয়ে এই অন্তরের চীবরই মানুষের সর্বোত্তম অলঙ্কার। আরও মহৎ হলো—এই "গুণ" আপনাদের মধ্য থেকে ঢেউয়ের মতো ব্যাপকভাবে সমাজ, দেশ তথা সমগ্র পৃথিবীকে সম্প্রীতি ও শান্তির জগতে রূপান্তরিত করবে।

আমি কামনা করি—আপনারা সকলেই উদার মন, বৃহৎ হৃদয় ও উন্মুক্ত চিত্ত নিয়ে তথাগতের এই চীবর পরিধান করবেন।

নিওয়ানো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১, 'বোধিবীজকে জাগ্রত করা' পৃ. ৯৯-১০১।

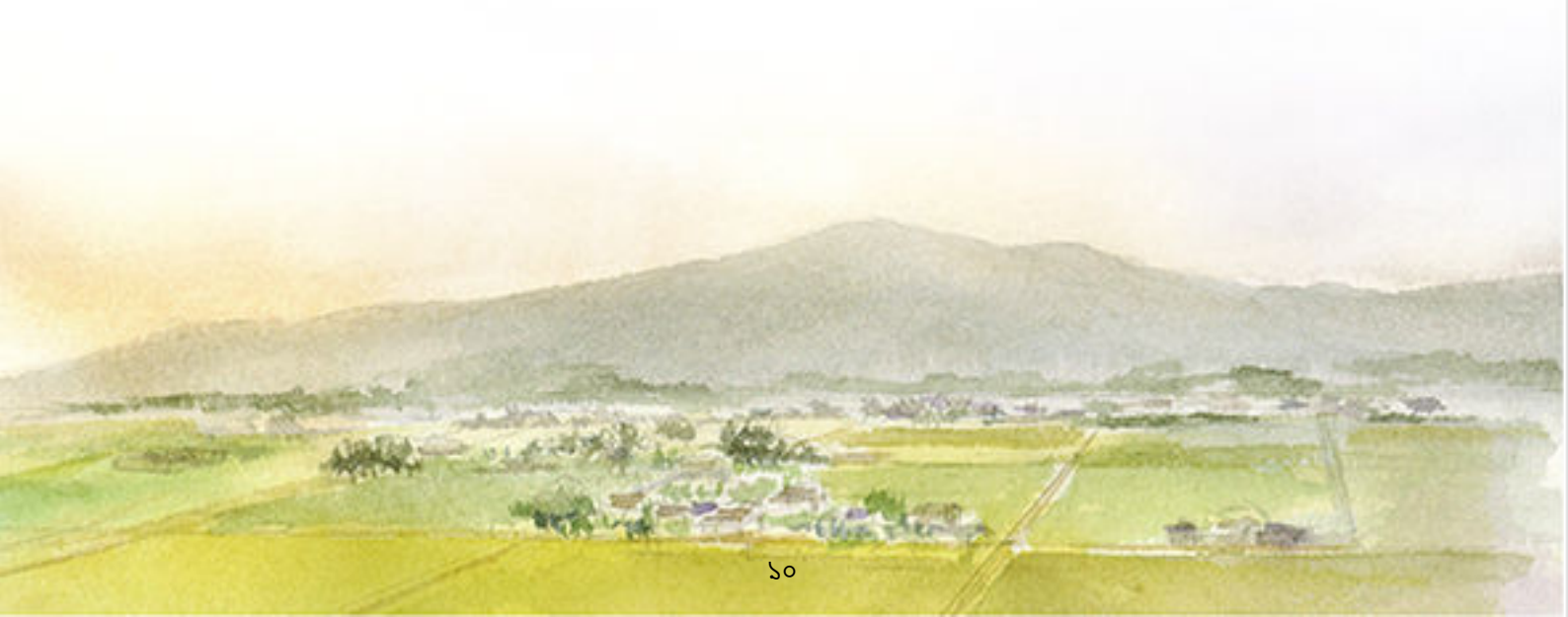

একাগ্র হৃদয়েই উন্মোচিত হয় ভবিষ্যৎ

রেভারেন্ড তাকাশি মায়েদা
পরিচালক, রিস্‌সো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক মিশন।

ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই, সমাজে যখনই বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে, তখনই মানুষের মনে অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ও অস্থিরতা দানা বেঁধেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো—সেই পরিবর্তনের যুগ থেকেই জন্ম নিয়েছে নতুন সমাজব্যবস্থা, নতুন চিন্তাধারা এবং জীবনযাপনের নতুন পথ। এই সত্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরাও আজ এমন এক পরিবর্তনশীল সময়প্রবাহের মধ্যেই জীবনযাপন করছি।

সম্মানিত প্রেসিডেন্ট বলেন—কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতিকে আমরা অসন্তোষ ও বিরক্তির চোখে দেখব, নাকি আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করব, তা সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজের মনের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, ঘটনাটি নিজে আমাদের দুঃখের কারণ নয়; বরং আমরা সেটিকে কীভাবে গ্রহণ করছি, তার ওপরই নির্ভর করে আমাদের কষ্ট বাড়বে নাকি হালকা হবে। একই ঘটনার মুখোমুখি হয়েও কেউ হয়তো আক্ষেপ করে বলে—"আমার সঙ্গেই কেন এমন হলো?" আবার কেউ সেই ঘটনাকেই শিক্ষার আলোয় গ্রহণ করে প্রশ্ন করে—"আমি এখান থেকে কী শিখতে পারি?" এই দুই মানসিকতার পার্থক্যই মানুষের অন্তর্জগতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত করে।

এই কারণেই কোনো ঘটনার প্রতি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে, একটু থেমে তার অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে ভাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধধর্ম আমাদের শিক্ষা দেয়—জগতের সমস্ত কিছুই কারণ ও পরস্পরনির্ভর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে। সুখের অভিজ্ঞতা হোক বা দুঃখের—উভয়ই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এই প্রতিটি অভিজ্ঞতাই আমাদের অন্তরকে পরিণত করে, আমাদের মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে।

জীবনের দিকে ফিরে তাকালে আমরা প্রায়ই উপলব্ধি করি—"সেই কঠিন সময় বা অভিজ্ঞতাগুলো না থাকলে, আজকের আমি হয়ে ওঠা সম্ভব হতো না।" তাই বিশেষ করে যখন উদ্বেগ, সংশয় বা অনিশ্চয়তা আমাদের ঘিরে ধরে, তখন বাইরের জগতে উত্তর খোঁজার আগে নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন। আর তারপর, আমাদের উচিত এই প্রশ্ন করা—"এই মুহূর্তে আমি কোন ছোট পদক্ষেপটি নিতে পারি?" সেই পদক্ষেপ হয়তো খুব ছোট হতে পারে, কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে নেওয়া কোনো পদক্ষেপই কখনও বৃথা যায় না। কারণ, প্রতিটি দৃঢ় ও সচেতন পদক্ষেপই সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটি নতুন পথ নির্মাণ করে। আর সেই পথ ধরেই ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় আমাদের নতুন ভবিষ্যৎ।

৬ই এপ্রিল, আন্তর্জাতিক মিশন বিভাগের কার্যালয়ে মঙ্গোলিয়া উলানবাটর শাখা থেকে তীর্থ ভ্রমনে আসা সদস্যদের স্বাগত জানানো হয়। (বিভাগীয় প্রধান মায়েদা সামনের সারির মাঝখানে আছেন)।

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

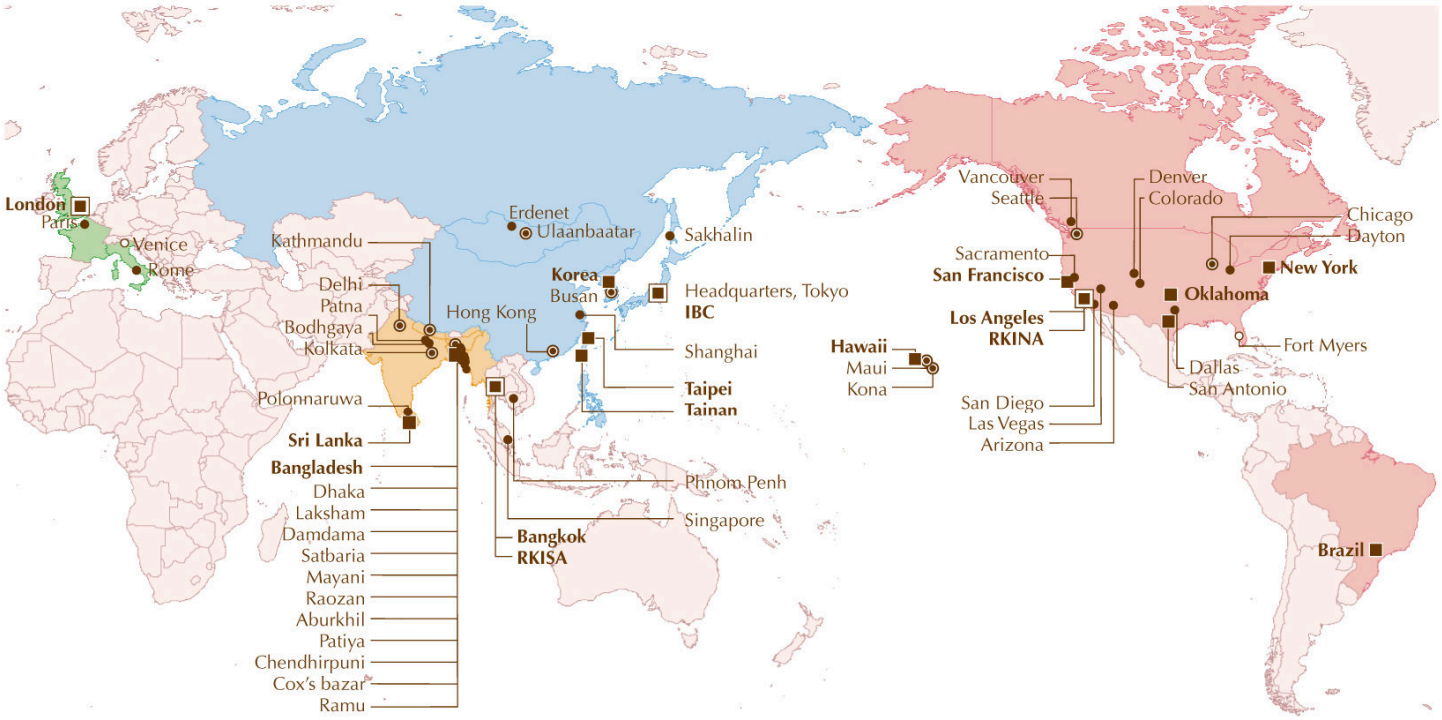

Information about local Dharma centers

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp